একটি দিন

শ্রীমনতোষ সরকার

প্রথম বর্ষ—বিজ্ঞান বিভাগ।

তখন আমি 1st yrএ পড়ি। স্কুলের মধুময় স্নেহের সুখ-স্পর্শ ত্যাগ করে সবে কলেজের বিরাট প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছি—আশা আকাঙ্ক্ষাকে আমার চল্‌তি পথের পাথেয় ক'রে। সে সমস্ত আশার পরিসমাপ্তি কোথায় এবং কোন্ জীবনে কে জানে?

স্কুলে যখন পড়তাম তখন কলেজীয় জীবনকে কত বিচিত্র রঙ্গিন কল্পনার আপনার দ্বারাই না রাঙ্গিয়ে তুলেছি। স্কুলের একঘেয়ে জীবনে যখন বিরক্তি ধরে যেত তখন কলেজের সদাহাস্য ছাত্রদের কথা মনে পড়ায় মনে মনে তাদের কত হিংসাই না করেছি। কবে এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ প্রবেশিকা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলেজের প্রশান্ত মহাসাগরে তরী ভাসাব সেই চিন্তায়ই রাত্রিদিন মস্‌গুল থাকতুম। আজ বুঝি সেই চিরবাঞ্ছিত দিন এসেছে। কিন্তু কই সেই সৌন্দর্য্য, সে মধুরিমা কোথায় যা দিয়ে আমি এতদিন আমার স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুলে-ছিলুম? তাসের ঘরের মত সেই সুখময় প্রাসাদ আজ ধূলিসাৎ হয়েছে নৈরাশ্যের অন্ধকারে মন আমার হাহাকার করে উঠ্‌ছে। উলঙ্গ বাস্তবের সঙ্গে সেই মধুর কল্পনার আজ কি প্রভেদ! কৃত্রিমতার এতবড় প্রতীক কি আর কোথাও আছে? দুদিনেই কলেজ জীবনের যে আস্বাদ আমি পেয়েছি তাতে মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নেই। তাই দিনের পর দিন যায়, আমারও কলেজে যাবার বিরাম নেই—নাস্তে ফিরেও আসতে হয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নয়—নিরানন্দের পসরা মাথায় করে।

এই বৈচিত্রহীন নিরানন্দময় জীবনেরই এক বর্ষাবিধৌত দিনের কথা আজও ভুল্‌তে পারি নি। সেদিন আর কিছুতেই ঘরে বসে থাক্‌তে পারলুম না। তাই পা'দুটিকে চালিয়ে দিলুম আস্তে আস্তে গঙ্গার দিকে। এই সেই গঙ্গা যার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কবি কবিত্ব রসের ফোয়ারা ছুটিয়েছে—কত প্রেমিক তার হারাণ দিনের প্রেমাস্পদের কথা স্মরণ ক'রে অলক্ষিতে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে, যার কলনাদের ভিতর কত দুঃখী তার দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আমার একি হল? নির্ব্বিকার চিত্তে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে অস্তায়মান সূর্য্যের পানে শুধু তাকিয়ে রইলুম। আর ঐ যে কলহোলা নদী কোন্ বিরহিণীর বাণী নিয়ে ছুটে চলেছে দূর হ'তে দূরান্তরে তার সেই অবোধ্য ভাষার ভিতর যেন আমার চিন্তার খোরাক খুঁজে পেলুম। "মানব জীবনের পরিণতি ও সফলতা কোথায়—স্বার্থ-সাধনে না পরার্থ-সাধনে"। নিজের সুখদুঃখই কি সব?

আজ যে সব ব্যথিতের দীর্ঘ-নিশ্বাসে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে সেই অত্যাচারিত, অবহেলিত সবহারাদের জন্য আমার করবার কি কিছুই নেই? ঐ যে কলকোলাহলময় সহরের মধ্যে শ্রমিক মজুরের দল বৎসরের পর বৎসর ধরে দুঃখদারিদ্র্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, সমস্ত কি অপ্রতিবিধেয়? তাদের জীবনে আজ সুখ, আনন্দ বলে কোন জিনিষ নেই। তারা কি শুধু কাঁদতেই এসেছে? হাসবার অধিকার তারা হারাল কোন যুগে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফলে? তাদের এই কান্নাই তো মালিকদের হাসির উৎস। ঐ সমস্ত মালিকের, ধনিকের দল কি একবারও ভেবে দেখে যে, তাদের আরাম আয়াসের জন্য যারা ভোর না হতে মুখে কোন রকমে দু মুঠো বাসি অন্ন গুঁজে দিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে নীরবে মুখ বুজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছে তারা মল' কি বাঁচল? না ভাবাই হয়তঃ স্বাভাবিক। স্বার্থান্ধ মানব! যতদিন স্বার্থে ঘা না লাগে, যতদিন আরামের স্রোতে ভাঁটা না পড়ে ততদিন তাদের চোখ খোলে না। যখন খুলবে তখনই বা তারা কি করে? হয়তো কাকেও বরখাস্ত করবে, কারও জরিমানা করবে অক্ষমতায়, কাজ না করার অজুহাতে।

কিন্তু ভেবেও দেখে কি প্রকারান্তরে এর জন্য কারা দায়ী? কেন তারা আজ আর খাটতে পারছে না? এর উত্তর কে দেবে? মালিকরা শুধু চায় কাজ, কাজ আর কাজ। মজুররা যে দারুণ পরিশ্রম করেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না ফলে সপরিবারে মরণের শান্তিময় ক্রোড়ে এগিয়ে চলেছে সেদিকে কি স্বার্থসর্ব্বস্ব ধনিকগণের নজর আছে?

সবচেয়ে দুঃখ যে এতদিনের দারিদ্র্যের অত্যাচারের জগদ্দল নিষ্পেষণে আজ তারা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে, সুখ দুঃখ বোধ হারিয়েছে, এমন কি নিজের বিবেক বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারিয়েছে। আজ তারা অভিযোগ করতে পারে না, প্রতিবাদ করতে পারে না। কেননা তারা আজ বীর্য্যহীন ভাষাহীন মূক। নিজেদের অভাব অভিযোগ তারা আজ জোর গলায় বলতে পারেন। শান্তির বুলি ব'লে ব'লে মালিকরা আজ তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে – শোষক ও শোষিতের নৈতিক জ্ঞান আজ এক হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে মানবজীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। তাদের মধ্যে এখন অশান্তির বার্ত্তা বিপ্লবের বাণী নিয়ে গেলে তারা চম্‌কে উঠে কোন অজানা এক আশঙ্কায়। নিজের অবস্থা তাহাদিগকে বুঝিয়ে দিতে গেলে তারা এড়িয়ে চলে। নৈতিক অবনতির আর কি বাকী আছে? আজ তাই—

সেই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

তাদের মধ্যে গিয়ে বলতে হবে "হে সবহারাদের দল, একবার তোমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বের হয়ে এস, জগতের অন্য দেশের ভাইদের দিকে চেয়ে দেখ কি বিরাট

আন্দোলন তারা আজ চালিয়েছে, যত সব ধনিক ও মালিকদের বিরুদ্ধে। তোমরাই কি শুধু অতীতের অন্ধ সংস্কার নিয়ে জড়বৎ নিশ্চল হয়ে থাকবে? যা অতীত, যা বিগত তা কোনদিন অনাগতকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না? তোমাদের অবস্থার সঙ্গে একবার তাদের অবস্থার তুলনা করে দেখ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে তারা আজ কি পেয়েছে, এবং কি পেতে চলেছে।"

কিন্তু হায় যাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে যাব, যাদের আমরা সেবা করব, যাদের আমরা মৃত্যু মরণের হাত থেকে বাঁচাবে তারাই আমাদের গলায় দেবে ফাঁসী তারাই আমাদের প্রতি করবে নিদারুণ কৃতঘ্নতা। এই অকৃতজ্ঞতাই তো হ'ল পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাত। শ্রদ্ধা নেই, সহানুভূতি নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, বিষাক্ত সাপের মত সবাই আমাদের এড়িয়ে চলবে। নৈরাশ্য পরাজয় প্রতি পদে ছুঁচের মত বিঁধবে! কারণ এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না।

আজ শ্রমিকদিগকে তাই বিপ্লবের নেশায় পাগল করে দিতে হবে। বিপ্লব মানে কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়, অতি দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন। তাহাদিগকে বুঝতে হবে যে তারাও মানুষ, শুধু কাজ করবার যন্ত্র তারা নয়। তাদেরও আত্ম-সম্মান বোধ আছে, তারাও দেখাতে জানে কেমন করে দেশকে ভালবাসতে হয়। কিন্তু চাই সেই রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গানো সোনার কাঠি, যার স্পর্শে তাদের এ অচেতন অবস্থা ভেঙ্গে যাবে।

সেই সোনার কাঠিই তো হচ্ছে স্বাধীনতা, স্বাধীনতায়ই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম্ম, কাব্য, শান্তি, বিবেক আরও বড়। এদের একান্ত ভাবে বিকাশ করে তোলাই হচ্ছে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য। নতুবা স্বাধীনতা শুধু অক্ষর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু হায় স্বাধীনতা দাবী করবার অধিকার কি আমাদের আছে? চেষ্টা করা দূরের কথা কামনা করাও যে ইংরেজ রাজত্বে পাপ, রাজদ্রোহ। দেশবাসীর দুঃখ দূর করবার অধিকারও আমাদের নেই—অধিকার আছে শুধু চোখ মেলে নিঃশব্দে চেয়ে দেখবার।

আর ভাবতে পারলুম না। আমাদের এই উপায়হীন অক্ষমতার কথা ভেবে কি জানি কেন চোখদুটী অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবার সেই হোষ্টেলের দিকে পা বাড়ালুম।